নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃ: ২৭-৪৪
© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোঃ ইব্রাহীম খালেদ*

বিজ্ঞান ও জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক রাজনীতি

১. ভূমিকা

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। IPCC বা Inter Governmental Panel for Climate Change যা কিনা প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের একটি দল, তারা নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাচ্ছে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য সংস্থাটি ২০০৭ সালে নোবেল পুরস্কারও পায়। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাসহ নানান পরিবেশবাদী দল জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা নিয়ে নানাভাবে সরকারসমূহকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। এ বিষয়টি নিয়ে নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন সবার দৃষ্টি আর্কষণ করতে সমর্থ হয়েছে। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন একটি পাবলিক ডিসকোর্সেও[১] পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনকে ডিসকার্সিভ প্রক্রিয়ায় সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে বিজ্ঞান ও তার নৈতিক জ্ঞান (Taylor and Buttel 2006)। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আমরা যে বলছি ও বিশ্বাস করছি জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে, তার ব্যাখ্যা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? তার ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানীই দিয়ে দিচ্ছে না? তাহলে কি এটাই দাঁড়ায় না যে, বিজ্ঞানই আমাদেরকে চুড়ান্ত সত্য বলে দিচ্ছে? বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে আমরা কোনরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকেই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। বিজ্ঞান জলবায়ু পরিবর্তনকে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে একটা ছাঁচের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে (Taylor and Buttel 2006)। আর তাই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই 'আমাদের' ব্যাখ্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। একই কারণে বিজ্ঞান যে সত্যের কথা বলে তার বস্তুনিষ্ঠতা ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বলে নেয়া ভালো, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা সঠিক না ভুল তা অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয় নয়।[২] বরং এখানে জলবায়ু পরিবর্তনকে কেস হিসেবে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা কীভাবে আমাদের চিন্তা ও বোঝাবুঝিকে একটি ছাঁচের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে এবং একটি নির্দিষ্ট পথের দিকে নিয়ে যায়।

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ইমেইল: mik0009@hotmail.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়ন সমাজ-সংস্কৃতি বিযুক্ত কোন বিষয় নয় (Latour 1999)। আর তাই এই অধ্যয়নকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায় না। অনেক দার্শনিক ও সামাজিক বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞান, সমাজ কাঠামো ও রাজনীতি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত (যেমন: Latour 1999; Taylor and Buttel 2006; Haraway 1991-এর কাজ)[৩]। এই কাজসমূহ দেখিয়েছে যে বিজ্ঞান কোনটাকে সঠিক বা ভুল বলবে তার জন্য যেমন বিজ্ঞানের ভিতরকার গ্রহণযোগ্যতা প্রয়োজন পড়ে একই সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন পড়ে। তাহলে এখন বোঝা প্রয়োজন 'রাজনৈতিক' বলতে এই প্রবন্ধে কী বোঝানো হচ্ছে ও রাজনীতি কীভাবে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে? বিজ্ঞানের কার্যক্রমে কিছু ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করা হবে, কোন বিশেষ বিষয়কে নিয়ে গবেষণা করা হবে ও কাকে লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা দেয়া হবে—এই বিষয়গুলোতে যেমন কিছু বিষয়কে গ্রহণ করা হয় আবার কিছু বিষয়কে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদ দেয়া হয় (Latour 1999)। বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যাতে সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে মানুষের যে ভিন্নতা তাকে আড়ালে নিয়ে এক ধরনের নৈতিক ও সর্বজনীন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয় (Taylor and Buttel 2006)। এই নৈতিক ও সর্বজনীন ব্যাখ্যার কারণে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ঐ রাজনীতি আড়াল হয়ে যায় ও আমাদের কাছে স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত বিষয় হিসেবে সামনে চলে আসে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা বা সমাধানের জন্য যে পলিসিসমূহ তৈরি করা হয় সেখানেও কাজ করে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা (Giddens, 2008)। যা জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাকে স্বাভাবিকতার এমন চাদরে ঢেকে দেয় যে 'আমরা' তা প্রশ্নহীন ভাবে মেনে নেই। এই আমরা হচ্ছি বৈশ্বিক 'আমরা'। স্থানিক সমাজ-সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন ও বোঝাবোঝির ভিন্নতা আড়ালে গিয়ে আমরা সাবাই বৈশ্বিক 'আমরা' হয়ে উঠি। বৈশ্বিক রাজনীতি এখানে নৈতিকতায় রূপ নেয়। আবার এই 'আমরা' কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শক। বিজ্ঞানের নৈতিকতা আমাদের মাঝে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা তা কোনরূপ প্রশ্ন ছাড়াই নিজের ভাবনা হিসেবে ধরে নেই। এই প্রবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তনকে উদাহরণ নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও সমাধানের পলিসিসমূহে স্থানিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে ও কীভাবে বিজ্ঞানের নৈতিকতা দ্বারা এই রাজনীতি আড়ালে গিয়ে একটি সর্বজনীন ও প্রশ্নহীন পলিসি হিসেবে আমাদের সামনে চলে আসে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও তার পলিসিসমূহ

বিজ্ঞানের ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে দীর্ঘসময় ব্যাপী আবহাওয়ার পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন।[৪] অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে পৃথিবীর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের হার যা আশা করা হয়েছিল তার তুলনায় কম বা বেশি পরিবর্তন হওয়া। আবহাওয়ার পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু একে সমস্যা হিসেবে তখনই মনে করা হয় যখন যে পরিমাণ পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল তার থেকে অধিক পরিবর্তন হয়। যেমন আজ থেকে ১০০ বছর আগে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যা ছিলো তার থেকে বর্তমানে তাপমাত্রা বেশি। তবে এই তাপমাত্রা

বৃদ্ধির পরিমাণ যা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। তাই এই পরিবর্তনকে সমস্যা হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক কারণে যেমন হচ্ছে তেমনি মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন কারণেও হচ্ছে। তেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যাধিক ব্যবহারের কারণে ওজোনস্তরে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। যার ফলে ভূ-মণ্ডলে একটি গ্যাসীয় আবরণ তৈরি হচ্ছে (Boehmer-Christiansen 1994)। এই গ্যাসীয় আবরণটিরই নাম দেয়া হয়েছে গ্রীন হাউজ গ্যাস। বলা হয় এটি তাপমাত্রা বিকিরণে বাধা দেয়, তাই পৃথিবীর উষ্ণতা দিনদিন স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি ঘটাছে। এই পরিবর্তনকে কীভাবে হ্রাস করা যায় তা নিয়েই এখন পৃথিবীতে চলছে নানা দৌড়-ঝাঁপ (কেউ কেউ বলেন লোক দেখানো)। এটি হ্রাস করার নানা ব্যাখ্যা যেমন আসছে তেমনি জলবায়ু পরবির্তনের সাথে কীভাবে অভিযোজন করা যায় তা নিয়ে আসছে নানা প্রস্তাবনা। আমি এই প্রবন্ধে আগ্রহী পলিসিসমূহ নিয়েঃ কীভাবে এই পলিসি সমূহ আকার ধারণ করছে ও আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে তা নিয়ে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বৈজ্ঞানিক চিন্তাসমূহ। বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সত্যের আলোচনা এমন একটি বাস্তবতা আমাদের মাঝে তৈরি করে যাতে করে বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ঘটে ১৯৮৭ সালে বায়ুমণ্ডলে 'Ozone hole'-এর আবিষ্কার এবং 'Our common future' নামক Brundtland commission report প্রকাশের মাধ্যমে। এর পূর্বে Stockholm conference এ UNEP (United Nations Commission on Environment Programme) গঠিত হয় ঠিকই কিন্তু এখানে স্থানিক কিছু ইস্যুভিত্তিক বিষয়ই কেবল উঠে আসতো (যেমন, সাগরে তেল ও বর্জ্য নিক্ষেপণ)। ১৯৮৭ সালে, ব্রুন্ডটল্যান্ড কমিশন রিপোর্ট ও রিও ডি জেনেরিও সম্মেলনেই প্রথম ব্যপক আকারে বৈশ্বিক পরিবেশগত হুমকির বিষয়টি উঠে আসে। এসময় বিজ্ঞান হয়ে যায় জলবায়ু পরিবর্তনকে বোঝার একমাত্র উপায়। ১৯৮৭-এর ব্রুন্ডটল্যান্ড কমিশন রিপোর্ট ও রিও ডি জেনেরিও সম্মেলনের পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্পর্কিত পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহই মুখ্য ভূমিকা রাখে। বিষয়টি বোঝা যায় আন্তর্জার্তিক জলবায়ু পরিবর্তন পলিসির ইতিহাসের দিকে নজর দিলে। এই ইতিহাসকে এখানে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। ১. ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশক, যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রাথমিক ভিত্তি দাঁড় করানো হয়। ২. ১৯৮৫-১৯৮৮ পর্যন্ত, যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহ একটি রাজনৈতিক এজেন্ডায় পরিনত হয়। ৩. ১৯৮৮-১৯৯২ পর্যন্ত, যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহকে আন্তর্জার্তিক পলিসি লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪. ১৯৯২-বর্তমান, যখন জলবায়ু পরিবর্তন একটি দরকষাকষির পর্যায়ে চলে আসে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা সমূহের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করা হয় ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে। এক্ষেত্রে গ্রীন হাউজ গ্যাসের আবিষ্কার মুখ্য ভূমিকা পালন করে (Bodansky 1995)। ১৯৬০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা দেখান যে গ্রীন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির যে আশঙ্কা তাঁরা

করছিলেন তা সত্যিই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে তখন থেকেই বিতর্ক শুরু হয় যার ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত রয়েছে। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণার সুযোগ তৈরি হলে বিজ্ঞানীরা সবাইকে আরো ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে গ্রীন হাউজ গ্যাস আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (Bodansky 1995)। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭-এ ব্রুন্ডটল্যান্ড কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ও পরবর্তীতে UNEP গঠিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা কেবলমাত্র সচেতনতা তৈরিতেই আবদ্ধ ছিলো না, একে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে আন্তজার্তিক পলিসি এজেন্ডাতেও। এই কাজটি দুইভাবে করা হয়েছে। প্রথমত, কিছুসংখ্যক পশ্চিমা বিজ্ঞানী যেমন Bart Bolin (পরবর্তীতে এর IPCC এর সভাপতি) জলবায়ু পরিবর্তনকে আন্তজার্তিক এজেন্ডাতে নিয়ে আসে। তারা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জ্ঞানের প্রচারক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন জার্নালে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি নিয়ে লেখালেখি করে। তাদের কেউ কেউ UNEP এর পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পায়। যার মাধ্যমে তারা জলবায়ু পরিবর্তনকে সচেতনতা থেকে আন্তজার্তিক পলিসির এজেন্ডাতে পরিণত করে। দ্বিতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে বাস্তব জগতের কিছু পরিবর্তনকে সম্পর্কিত করা হয়। ঝড়-বৃষ্টির বৃদ্ধি, ওজোনস্তরের ক্ষয়, বন ধ্বংস, জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস, সমুদ্রের পানি দূষণ ইত্যাদির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হয়। এ সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তথাকথিত 'এন্টার্কটিক ওজোন ছিদ্রের' আবিষ্কার। বলা হয় আমাদের রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের কারণে যে CFC (Cloroflorocarbon) গ্যাস নির্গত হয় তা এন্টার্কটিকে বরফের পুরুত্ব কমিয়ে ফেলছে। এর মাধ্যমে হঠাৎ করেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে মানুষ ও তার কার্যক্রমকে দায়ী করা হয়। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি পৃথিবী ব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিষয়টি সেসময় কতটা ঝড় তুলতে পেরেছিলো তা বোঝা যায় ১৯৮৮ সালে *Time* ম্যাগাজিনের শিরোনাম দেখলে। এর শিরোনাম ছিলো *Endengered Earth: Planet of the Year.*

১৯৮৮ সালটি জলবায়ু পরিবর্তনের পলিসি বোঝার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসময়ে IPCC বা Inter Governmental Panel for Climate Change প্রতিষ্ঠিত হয়। IPCC জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটিকে আন্তর্জাতিক পলিসি লেভেলে স্থান দেয়। যার ফলে রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন একটি মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালে IPCC তার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে। কিন্তু এই রিপোর্টের ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র এর ফলাফল মেনে নেয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই ফলাফলের সময় ও প্রেক্ষাপট নিয়ে বিরোধিতা শুরু করে। তারা বলে এটি নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন কিন্তু তা হতে হবে রাষ্ট্রীয় পরিসরে, আন্তর্জাতিক পরিসরে নয়। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা আরো তীব্রতর হয়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্রের এই বিরোধিতার মূল কারণ ছিলো তাদের কাছে মজুদ থাকা বিশাল কয়লা, যাকে CO_2 নিঃসরনের প্রধান নিয়ামক মনে করা হয়। কয়লাকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে

ব্যাখ্যা করলে যুক্তরাষ্ট্র তার জ্বালানি খাতে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাই তারা তাদের মতো করে জলবায়ু পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চায়। আর এজন্যই তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গবেষণার দাবি উত্থাপন করে। অন্যদিকে অপশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। আবার ব্রাজিল, চীন ও ভারতের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ বলে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অধিকার রয়েছে। উত্তরের রাষ্ট্রসমূহই বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী, তাই তারাই ক্ষতিপূরণ দেবে। আবার তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রসমূহ তেলকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী করতে রাজি নয়। তারা এ বিষয়ে 'ধীরে চলো নীতির' কথা বলে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণা পলিসি লেভেলে আসার পর তা আইনে পরিণত করার চেষ্টা করা হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯২ সালে Rio de Generio-তে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি থেকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু আইন করার আগ্রহ দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষাপটে FCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) গঠিত হয়। রিও সম্মেলনের প্রথমে একে আইনী পর্যায়ে নিয়ে গেলেও উত্তরের রাষ্ট্র সমূহ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের আইনটি একটি ধারণা-কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই ধারণা-কাঠামোতে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণকে কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য কিছু সময় ও লক্ষ্য স্থির করা হয়। সময় ঠিক করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রসমূহ বিরোধিতা করে। এসময় জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলা করার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনে হুমকির মুখে যে রাষ্ট্রসমূহ রয়েছে (যেমন, বাংলাদেশ) তাদের আর্থিক সহায়তা দেবার কথা বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রসমূহ এই সহায়তা আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে দেয়ার কথা বলে। অন্যদিকে ব্রাজিল ও ভারত দাবি করে আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থার পাশাপাশি যে রাষ্ট্রসমূহ বিগত দশকে বেশি কার্বন নিঃসরণ করেছে, তাদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সম্মেলন করার প্রস্তাব করা হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে উন্নয়ন এজেন্ডার মিলন ঘটে। জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে উঠে উন্নয়ন এজেন্সিসমূহের উন্নয়নকার্য পরিচালনার অন্যতম একটি ইস্যু।

রিও সম্মেলনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এখানে উন্নত বিশ্ব ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ এর মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৫% পর্যন্ত কমিয়ে ফেলতে রাজি হয়। এছাড়া রিও সম্মেলনের অন্যান্য সমঝোতাসমূহ এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যপারে অঙ্গীকার করা হয়। এর কিছুদিন পর যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকল থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। যার প্রেক্ষাপটে আবার আলোচনা শুরু করা করা হয়। ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবানের লক্ষ্যে পরবর্তী পর্যায়ে COP বা Conference on Parties করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে পোল্যান্ডের পোজনানোতে, ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে, ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুনে, ২০১১ সালে দক্ষিন আফ্রিকার ডারবানে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। এই সম্মেলনগুলোতে রিও-এর সমঝোতা এবং কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকিতে থাকা রাষ্ট্রসমূহকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণাটি শুরু হয়েছিলো একটি সচেতনতার মাধ্যমে। কিন্তু পরবর্তী পর্য়ায়ে উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে যুক্ত হয়ে এটি চলে এসেছে দরকষাকষির পর্যায়ে। বিজ্ঞান তার নৈতিক মানদণ্ড তুলে ধরে এমন একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছে যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যার কারণে সবার ভাবনা কেন্দ্রীভূত হয় জলবায়ু পরিবর্তনকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে, কে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা নিয়ে নয়।

৩. IPCC ও তার বৈশ্বিক জ্ঞানের রাজনীতি

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারণা প্রবন্ধের প্রথমে আলোচনা করেছি তা থেকে বোঝা যায় যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক ধারণা। বৈশ্বিক এই বোঝাবুঝি একটি বৈশ্বিক পরিবর্তনের একটি ধারণা তৈরি করে দেয়, যা আবার বৈশ্বিক উন্নয়নের রাজনীতির পথ সুগম করে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক বিষয় সেক্ষেত্রে এর পলিসিসমূহও হয় বৈশ্বিক। বৈশ্বিক পলিসির এই পরিসরে জ্ঞান, ক্ষমতা ও রাজনীতি গ্রন্থিত অবস্থায় থাকে (Brock 2001)। এখানে নানা ধরনের এক্টর থাকে—আন্তর্জাতিক সংগঠন, রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, এন.জি.ও., মিডিয়া ইত্যাদি। তবে প্রত্যেকের সমান সুযোগ থাকে না। কারো কারো ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কিছু সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আন্তজার্তিক সংগঠন তার বৈশ্বিক ধারণা যৌক্তিক করে তুলতে বিজ্ঞানের নৈতিকতাকে ব্যবহার করে। ফলে সবার কাছে তা বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে সামনে আসে। স্থানিক পরিসরে আবার রাষ্ট্র তার মতো করে পলিসি ঠিক করতে বিজ্ঞানের নৈতিকতাকে ব্যবহার করে (Giddens 2008)। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক পলিসিসমূহ একটি নৈতিক বিষয় হিসেবে সর্বমহলে ছড়িয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক এই ধারণা প্রচারণার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এক্টর হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের কাছেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের বয়ান। গণমাধ্যমের প্রচারণায় বিজ্ঞানের বয়ান হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য। এখানে বিজ্ঞানের বক্তব্যকে প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেয়া হয় ও প্রচার করা হয়। এর ফলে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় যে বৈশ্বিক রাজনীতি কাজ করে তা স্থানীয় মানুষের কাছে আড়াল হয়ে যায়। এই প্রচারণায় পৃথিবীর সকল মানুষকে এক ভাবা হয়। সমাজ-সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, মূল্যবোধের ভিন্নতা, সামাজিক চাহিদার ভিন্নতা ইত্যাদি দেখা হয় না। যে মানুষটি ঐ প্রচারণা শুনছে ও বিশ্বাস স্থাপন করছে সে নিজেই নিজের বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। মূলত বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা ও সার্বজনীনতার উপর অবিচল বিশ্বাস তাকে তার প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

এ বিষয়টিকে বোঝার জন্য Intergovernmental Panel on Climate Change বা IPCC এর উদাহরণ দেয়া যায়।[৫] IPCC-এর প্রধান কাজ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি,

প্রভাব ও কী পলিসি নেয়া যায় এ বিষয়ে কিছু বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা করা (Houghton, Jenkins & Ephraums 1990)। এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য যে বৈশ্বিক ধারণাকে স্থানিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার একটি হাতিয়ার মাত্র তা বোঝা যায় IPCC-এর প্রথম সভাপতি বার্ট বোলিনের বক্তব্যে। তাঁর মতে: *IPCC তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞানের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকতর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে।* এর অর্থ এই যে জলবায়ু পরিবর্তনের পলিসি সমূহকে যতবেশি বিজ্ঞান সম্মত করা যাবে ততবেশি একে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করানো যাবে। এই প্রেক্ষাপটে IPCC-এর প্রথম রিপোর্টে বলা হয় গ্রীনহাউজ গ্যাসের নির্গমনের জন্যই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে (Houghton et al. 1990)। দ্বিতীয় রিপোর্টে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা রয়েছে (Houghton et al. 1996)। তৃতীয় রিপোর্টে বলা হয় গত শতকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং এর কারণ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া।

আনুমানিক ২০০০-এর মত বিজ্ঞানী IPCC-এর এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এর বিরুদ্ধবাদী কিছু বিজ্ঞানীও রয়েছে, তাদের মতে IPCC তার জ্ঞানকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপকে বিবেচনা করেনি (Boehmer-Christiansen 1994; Miller and Edwards 2001)। এই বিরুদ্ধবাদী জ্ঞানকে কিন্তু ফেলে দেয়া হয় না। একে নানাভাবে আত্তীকরণ করা হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য 'Anchonig'-এর ধারণা ব্যবহার করা যেতে পারে। Moscovici (1984) এই 'Anchonig'-এর ধারণা ব্যবহার করে বলেন, পলিসির পরিসরে যখন নতুন কিছু আসে তখন তাকে আত্তীকরণ করা হয়। নতুন ধারণা সমূহকে পুরাতন ধারণা, পদ্ধতি দ্বারা বিদ্যমান পলিসির সাথে সাদৃশ্যকরণ করা হয়। ফলে ঐ নতুন বিষয়সমূহ বিদ্যমান পলিসির জন্য ঝামেলাহীন ও অ-হুমকি স্বরূপ হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াতেই বিরুদ্ধবাদী ধারণাসমূহকে IPCC আত্তীকরণ করে স্থানিক ভিন্নতায় গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া দেখার কথা বলে। কিন্তু তারা বৈশ্বিক ব্যাখ্যাকেই মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেয়। আর তাই সামান্য পরিবর্তন হলেও IPCC-এর পূর্বতন ব্যাখ্যা সমূহই তার অবস্থান ধরে রাখে।

IPCC একটি হাউব্রিড সংগঠন, যা পলিসি ও বিজ্ঞানকে সংমিশ্রিত করে (Miller and Edward 2001)। হাইব্রিডের এই ধারণা Latour (1993) এর মতে, দ্বিমুখী রাজনীতির দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান যতবেশি রাজনীতির সাথে যুক্ত হবে, সে তার জ্ঞানকে ততবেশি বৈধ করে তুলবে। অন্যদিকে রাজনীতি যতবেশি বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত হবে সে তার পলিসিকে ততবেশি প্রশ্নহীন ও নৈতিক করে তুলবে। এভাবেই বিজ্ঞান ও পলিসির হাইব্রিডাইজেশনের ফলে পলিসির ভেতরকার টেনশন, দ্বন্দ্ব ও রাজনীতি আড়াল হয়ে যায়। বাইরে থেকে তাই যখন কেউ পলিসিকে মূল্যায়ন করে তখন যে একে স্বাভাবিক হিসেবে খুঁজে পায়। এক্ষেত্রে ফুকোর ধারণা দিয়ে বুঝলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। মিশেল ফুকোর (১৯৭৭) মতে ক্ষমতা সকল সামাজিক সম্পর্কে অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে। ক্ষমতা তার ডিসকার্সিভ প্রক্রিয়ায় তার সাবজেক্টের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। ফলে ব্যক্তির কাছে গ্রহণ করার জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট উপায়ই সামনে আসে। বৈশ্বিক ক্ষমতা যে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের

ডিসকোর্স তৈরি করে তা ডিসকার্সিভ প্রক্রিয়ায় আমাদের চিন্তাকে আবদ্ধ করে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত করে। আর এ কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের যে পলিসিসমূহ আমাদের সামনে আসে সেখানে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যিক ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে, যা কিনা আমরা প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেই।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক রাজনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বহীনতা

বিজ্ঞান যে সত্য তৈরি করে তা যেমন নৈতিক ও প্রশ্নহীন হয়ে যায় ঠিক তেমনি এটি একটি বৈশ্বিক রাজনীতির পরিসরও তৈরি করে দেয়। আবার যেহেতু এই সত্য প্রশ্নহীন তাই এই বিষয় নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আমরা দেখি যে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা তা আমাদের সামনে দু'টি বিষয় হাজির করে। প্রথমত, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যাকে একটি আবশ্যিক ও সর্বজনীন সত্যে পরিণত করে, যা কিনা পৃথিবী ব্যাপী একই রকম বলে ভাবা হয়। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের পরিসরকে আবদ্ধ করে দেয়। ভাবা হয় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যেহেতু কোন সন্দেহ নেই তাই এ নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের খুব বেশি ভাববার নেই। সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ হবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের উপর কীভাবে বা কীরূপে পড়বে তা নিয়ে অধ্যয়ন করা। প্রথম অংশটিকে বোঝার জন্য আমরা এখানে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পলিসি সমূহের দিকে আলোকপাত করবো ও বোঝার চেষ্টা করবো কীভাবে এই পলিসি সমূহ বৈশ্বিক রাজনীতির অংশ। দ্বিতীয় অংশটিকে বোঝার ক্ষেত্রে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা সমূহকে পুনর্মূল্যায়ন করে দেখার চেষ্টা করবো আদৌ তা একক সত্য বলে কিনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যয়ণে সামাজিক বিজ্ঞান মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে কিনা।

৪.১. বিজ্ঞানের বৈশ্বিক নৈতিকতায় স্থানিক বোঝাপড়াঃ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশের পলিসিসমূহ

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ তার প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা পত্র বা Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রকাশ করে।[৬] এখানে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের উৎসসমূহ লাঘব করার কথা বলা হয় তেমনি এর সাথে মানব অভিযোজনের পরিকল্পনা ও কৌশলের কথাও বলা হয়। এই কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা পত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এখানে IPCC-এর দেয়া ভাষ্যকেই নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ IPCC যেভাবে বিজ্ঞানের আদলে জলবায়ু পরিবর্তনেকে ব্যাখ্যা করেছে BCCSAP-তেও একইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্থানিক ভিন্নতাকে এখানে কেবলমাত্র অভিযোজনের ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে IPCC-এর ব্যাখ্যা স্পষ্টতই একটি বৈশ্বিক ব্যাখ্যা। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গ্রীন হাউজ গ্যাসকে দায়ী করা হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Co_2), মিথেন (CH_3), সালফার (S_2) এ ধরনের বিভিন্ন গ্যাস রয়েছে যা ওজোন (O_3) স্তরকে হালকা

করে দেয় ও সূর্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রবেশ সহজ করে। এর ফলে মানব শরীরের চামড়ার অসুখ (বিশেষতঃ সাদা চামড়ার ক্ষেত্রে, যা বলা হয় না) হতে পারে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায় তাই পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে (Houghton et al. 1996)। এ থেকে রক্ষার উপায় কী? উপায় হচ্ছে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের নির্গমন কমানো। তা না করা গেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে অভিযোজনের জন্য প্রস্তুত থাকা। এই হচ্ছে মোটামুট IPCC-এর বক্তব্য যা কিনা হুবহু BCCSAP তেও পাওয়া যায়। এই মেনে নেয়া আমাদের মাঝে প্রশ্ন তুলতে পারে কেন BCCSAP, IPCC এর ব্যাখ্যা হুবহু মেনে নিচ্ছে? কেন BCCSAP বাংলাদেশের নিজস্ব একটি দলিল হওয়ার পরও, স্থানিক বাস্তবতায় জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণায়নে ভিন্নতা থাকতে পারে কিনা, তা নিয়ে ভাবছে না? এর কারণ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানের নৈতিক ব্যাখ্যা, যা কিনা সর্বজনীনের সত্য হিসেবে সামনে আসে ও প্রশ্নহীন বয়ান তৈরি করে তাই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক বয়ানকে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। IPCC বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করে তার বৈশ্বিক ধারণায়নকে আবশ্যিক ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আর তাই BCCSAPও ঐ ব্যাখ্যাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

আমরা যদি BCCSAP-এর ইতিহাস লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো এই পরিকল্পনা পত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ তার জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রথম ডকুমেন্ট The National Adaption Pragramme of Action (NAPA) প্রকাশ করে।[৭] বর্তমানে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে এই কর্ম পরিকল্পনাটি ব্যর্থ। বিশ্বব্যাপী যখন জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের কথা বলা হয় তার আদলেই এই কর্ম-পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছিলো। এর সবচেয়ে বড় সমালোচনা হচ্ছে এটি জনমানুষ হতে বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন স্থানে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে এটি স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধের সম্মুখীনও হয়েছে। বিভিন্ন এন.জি.ও এবং উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যেও এ নিয়ে হতাশা দেখা যায়। মানুষকে বোঝাতে তাদের সবচেয়ে সমস্যা হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে কি না। আমার একজন বন্ধু যে কিনা NAPA-এর আদলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করেছে সে বলে:

> "মানুষ বোঝেই না যে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। তারা বলে এই বন্যা, খরা সব সময়ই হয়। এমনকি আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। একজন আরেকজনকে বলতো এই পুকুরে পানি নাই এটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। আজকে বৃষ্টি হয়নি এটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। আমার মাথার চুল নেই এটাও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ। এভাবে একটা হাস্যকর বিষয় হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে সবাই দেখে।"[৮]

এই হাস্যকর ও জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যাসমূহকে স্থানিক বাস্তবতায় না বোঝা। বিজ্ঞানের নৈতিক ব্যাখ্যা ও গণমাধ্যমে তা পরিবেশনের মাধ্যমে বিষয়টি একক সত্য হিসাবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু এই সত্য যে স্থানিক বাস্তবতার ভিন্নরূপ নিতে পারে তা স্থানিক নীতি-নির্ধারকরাও চিন্তা করে না। এই চিন্তা না করার কারণ বৈশ্বিক ডিসকোর্সের মধ্যেই স্থানিক বাস্তবতাকে বিবেচনা করে।

বাংলাদেশে যেমন NAPA ব্যর্থ হচ্ছিল তেমনি বৈশ্বিক পর্যায়েও অভিযোজনের ধারণা নানা সমালোচনার মুখে পড়ে। এ পর্যায়ে এসে IPCC তার গ্রীন হাউজ গ্যাস লাঘবের কথা বলে। একই সাথে অভিযোজনের কথাও বলে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বের ধারণাটিকে নতুন করে সাজানো হয়। বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে Martin Hajer (1995) এর story lines এবং discourse coalition প্রত্যয় দুটি খুব উল্লেখযোগ্য। Hajer-এর মতে, একটি ডিসকোর্স সমালোচনার মুখে পড়লে তার story lines বা গল্পটি সমস্যার মুখে পড়ে। তখন অন্য ডিসকোর্সের সাথে যুক্ত হয়ে গল্পটিকে গ্রহণযোগ্য করা হয়। এটি তখন কেবলমাত্র ঐ ডিসকোর্সের বোঝাপড়াই তৈরি করে না বরং ঐ ডিসকোর্সের গল্পটিকে শ্রবণ-শুদ্ধও করে তোলে। ঠিক এভাবেই অভিযোজনের গল্পটি সমালোচনার মুখে পড়লে গ্রীন হাউজ গ্যাসের কথা বলে জলবায়ু পরিবর্তনের গল্পটিকে যুক্তিযুক্ত ও শ্রবণশুদ্ধ করে তোলা হয়। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশে BCCSAP তৈরি করা হয়।

BCCSAP ধরে নিয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকা রাষ্ট্রের মধ্যে একটি। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে IPCC-এর রিপোর্ট। BCCSAP-এর ১১, ১২ ও ১৩ ধারাতে স্পষ্টতই IPCC-এর ব্যাখ্যা কোনরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকেই মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন, ১১ নং ধারাতে বলা হয়েছে:

> "IPCC অনুমান করছে একবিংশ শতাব্দিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা এর আগের দশকের চেয়ে ১.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৪.০ ডিগ্রী সে. পর্যন্ত বাড়তে পারে।"

আবার ১২ নং ধারাতে বলা হয়েছে:

> ৪র্থ IPCC তে বলা হয়েছে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের হার বাড়াবে। যার ফলে হিমালয় থেকে আসা নদীর পানির উচ্চতা বাড়বে (কতটুকু তা বলা হয়নি)।

১৩নং ধারাতে IPCC এর বরাতে বলা হয়েছে:

> জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে দুর্যোগের পরিমাণ বাড়বে। যা বাংলাদেশের বহুবিধ ক্ষতি করতে পারে।

এই কথাগুলোর সাথে সাথে BCCSAP-তে একধরনের তাড়ণা দেখা যায়। তাড়ণাটি এরকম যে এখনই কিছু করতে হবে নয়তো বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই তাড়ণাসমূহ ঐ পলিসিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে। Eileen Crist-এর মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান তাড়ণাসমূহ ১৯৭০-এর দশকের Limit to Growth-এর তাড়ণাকেও ছাড়িয়ে যায়।[৯] Limit to Growth এ বলা হয়েছে পৃথিবীতে যে পরিমাণ সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে তাতে একসময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তাই সম্পদ বুঝে ব্যবহার করতে হবে। এখান থেকেই টেকসই উন্নয়নের ধারণা আসে (Meadows et al. 1972)। কিন্তু বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের তাড়ণা এমন একটি ধারণা তৈরি করে যে এটিই বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। সমাধান হিসাবে অভিযোজন ও জলবায়ু পরিবর্তনের উৎসসমূহ (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন) নিঃসরণ লাঘব করতে বলা হয়। এটি তো আর এমনি এমনি সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন অর্থ এবং প্রযুক্তি। আর এখানেই কাজ করে বৈশ্বিক রাজনীতি।

কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নিঃসরণের জন্য তৃতীয় বিশ্বকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় রেইন ফরেস্ট ধ্বংস। অথচ সাম্প্রতিক একটি হিসেবে দেখা গেছে যে রেইন ফরেস্ট বর্তমানে যে পরিমাণ ধ্বংস হচ্ছে তা বিশ্বের মোট গ্রীন হাউজ গ্যাসের মাত্র ১৫ শতাংশে অবদান রাখছে। এই দায় চাপানোর সাথে সাথে দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চলে আসে কিছু বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। আমরা পূর্বে যে IPCC-এর আলোচনা করেছি এই IPCC কিন্তু জাতিসংঘেরই একটি প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘের সাথে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এরা সবাই বৈশ্বিক এজেন্ডার কথা বলে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি থেকে রক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহকে দিচ্ছে ঋণ। এই ঋণ আবার বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্সকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঋণের এই রাজনীতির কারণে একদিকে যেমন তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক এর নীতি অনুসারে উন্নয়নকার্য চালাতে বাধ্য হচ্ছে অন্যদিকে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদেরকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। কারণ তারা দাবি করে যে তারা পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ে কথা বলছে ও কাজ করছে।

ঋণের এই রাজনীতিকে Taylor & Buttel (1992) উল্লেখ করেছেন 'পরিবেশগত উপনিবেশবাদ' হিসাবে। কেননা পরিবেশকে পুঁজি করে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক এই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহকে ঋণের জালে আটকে ফেলছে ও তাদের বৈশ্বিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ধরনও ভিন্ন থাকে। যে রাষ্ট্র সমূহ বেশি ঋণের জালে আবদ্ধ তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কিন্তু তার মূল উন্নয়ন এজেন্ডা থেকে সরে আসে না। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যে অর্থ পাওয়া যায় তার সাথে শর্ত হিসাবে ব্রিজ নির্মাণ, গ্যাস উৎসরণের বিষয়গুলো থাকে। যা কিনা তৃতীয় বিশ্বের এই রাষ্ট্রসমূহকে আরো অধিক পরিমাণে পরিবেশগত ক্ষতির দিকেই নিয়ে যায়। এইতো গেল অর্থের বিষয়। প্রযুক্তি আরেকটি বিষয় যা জলবায়ু পরিবর্তনে খুবই প্রয়োজনীয় বলে ভাবা হয়। প্রযুক্তির এই প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তৃতীয় বিশ্বকে নতুন পণ্যের একটি বাজারে পরিণত করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা সমূহ একটি বৈশ্বিক ও সবর্জনীন ব্যাখ্যা হিসাবে আমাদের সামনে আসে। যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষকে বৈশ্বিক 'কল্পিত সম্প্রদায়' হিসেবে ভাবা হয়।[১০] যেখানে তারা একে অপরকে না দেখেও একই ভাবে জলবায়ু নিয়ে চিন্তিত। অন্যদিকে বিজ্ঞানে ব্যাখ্যা আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের পলিসি সমূহে যে রাজনীতি রয়েছে তা বুঝতে দেয় না। বিজ্ঞানের নৈতিকতার ধারণা ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক প্রপঞ্চ হয়ে উঠে এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন রাজনীতির একটি নতুন ক্ষেত্রেও রূপ নেয়।

৪.২. জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক বিজ্ঞানের আবদ্ধ পরিসর

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা একে সর্বজনীন সত্য হিসাবে তুলে ধরে। এর পিছনে মূল কারণ হচ্ছে জলবায়ু সম্পর্কিত জ্ঞানকে কেবল ভৌত বিজ্ঞান হিসাবে ভাবা হয়। তাই এই জ্ঞান দিয়েই একে অধ্যয়ন করা হয়। অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞানকে এক্ষেত্রে দ্বিতীয়

সারির বিজ্ঞান হিসাবে ধরা হয়। বিষয়টি এরকম যে, ভৌত বিজ্ঞান ঠিক করবে জলবায়ুর কীরূপ পরিবর্তন হচ্ছে আর সামাজিক বিজ্ঞান এই পরিবর্তনে মানুষের প্রভাব ও অভিযোজন নিয়ে অধ্যয়ন করবে। এ ধরনের ভাবনাটির সাথে নৃবিজ্ঞানের পরিবেশ নির্ধারণবাদ বনাম সাংস্কৃতিক নির্ধারণবাদের বিতর্ক সম্পর্কিত। পরিবেশ নির্ধারণবাদে ভাবা হয় কোন অঞ্চলের পরিবেশ ঠিক করে দেয় ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি কীরূপ হবে। এই ভাবনাটি সবচেয়ে প্রভাবশালী। এই ভাবনার কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যয়নকে দ্বিতীয় সারির চর্চা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানে মনে করা হয় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র ঠিক করে দেবে। আর মানুষ এর সাথে কীভাবে মানিয়ে নিতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবে সামাজিক বিজ্ঞান।

এ ধরনের চিন্তারই বিরোধিতা করে সাংস্কৃতিক নির্ধারণবাদ। সাংস্কৃতিক নির্ধারণবাদের বক্তব্য হচ্ছে পরিবেশ নয় সংস্কৃতিই নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তি তার পরিবেশের প্রতি কীরূপ আচরণ করবে। পরিবেশে যথেষ্ট সম্পদ থাকলেও ঐ সংস্কৃতিতে সে সম্পদ ব্যবহার নাও করতে পারে। এক সংস্কৃতির জন্য যা সম্পদ অন্য সংস্কৃতির জন্য তা সম্পদ হিসেবে নাও বিবেচিত হতে পারে। যে জন্য আমরা দেখি ভারতের মধ্যপ্রদেশে প্রচুর মাছ থাকলেও তাকে তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে না। অর্থাৎ সংস্কৃতি ঠিক করে দেয় আমি পরিবেশকে কীভাবে দেখবো। এই ভাবনাতে দেখলে বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তন একটি সামাজিক প্রপঞ্চ। কেননা সামাজিক বাস্তবতাই পরিবেশের উপর মানুষের ক্রিয়া ঠিক করে দেয়। এই বিষয়টি না বুঝলে কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ঠিক করে কোন লাভ হবে না। যেমন সম্পদের বণ্টনের উপর নির্ভর করে কোন একটি বছর কারো জন্য খরা হয়ে দেখা দেবে কি না। জমি ও ক্ষমতার অসমতা নতুন করে আবাসন তৈরি বা বন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়গুলো নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে নৃবিজ্ঞান, ভূগোল ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান কথা বলছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এরপরও সামাজিক বিজ্ঞানের এই আলোচনা সমূহকে জলবায়ু পরিবর্তনকে মূল ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত করা হয় না। এদেরকে আলাদা রাখা হয়।

এখন তাহলে আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে কেন সামাজিক বিজ্ঞান যে বাস্তবতার কথা বলছে তা জলবায়ু পরিবর্তনের মূল ব্যাখ্যা তথা ভৌত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত করা হচ্ছে না। এর কারণ হতে পারে সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যুক্ত করলে বিজ্ঞানের একক 'প্রশ্নহীন' ব্যাখ্যা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে ও 'সৌন্দর্য' হারাবে। সামাজিক বিজ্ঞান প্রধানত বলতে চায় জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর সকল স্থানে ও সকল সময়ে একই রকম হয় না। স্থান, কালভেদে এর মাত্রা, প্রভাব এমনকি সম্ভাবনাও ভিন্ন হতে পারে। একই সাথে সামাজিক বিজ্ঞান এও বলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনেক বেশি অনিশ্চয়তা ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল। এই অনিশ্চয়তা ও অনুমানকে একক সত্য ভাববার কারণ নেই। এর প্রমাণ আমরা পাই, কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানীরা বলে তারা দক্ষিণ মেরুর বরফ যে পরিমাণ গলবে বলে ভেবেছিলো সে হারে গলছে না।[১১] বিজ্ঞানের এ ধরনের আরো কিছু অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ নিয়েও। এটা স্পষ্ট যে IPCC গ্রীন হাউজ গ্যাসকে জলবায়ু পরিবর্তনের

সবচেয়ে বড় কারণ হিসাবে মনে করছে। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে তৃতীয় বিশ্ব কতটুকু গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ করছে তার বেঁচে থাকার জন্য আর প্রথম বিশ্ব কতটুকু করছে তার বিলাসবহুল জীবনের জন্য, তাহলে দেখতে পাবো গ্রীন হাউজ গ্যাসের জন্য তৃতীয় বিশ্বকে দায়ী করা অমূলক।

সামাজিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের সামাজিক দিকই স্পষ্ট করে না একই সাথে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সাথে যে বহুবিধ রাজনীতি যুক্ত তাকেও স্পষ্ট করে। Andrew Hoffman (2011) যেমন দেখান যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার অর্থেরই বেশীরভাগ যোগান দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ।[১২] যেমন ১৯৮৯ সালে যে The Glabal Climate Coalition (GCC) তৈরি হয়েছিল তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল এক্সন, জোনরেল মটরস, ফোর্ড মটরস ও টেক্সাকোর মতো বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ। এই প্রতিষ্ঠান সমূহ GCC এর মাধ্যমে এমন কিছু ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছিল যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তনে যে পলিসি নেয়া হয় তাতে তাদের ক্ষতি না হয়। ২০০২ সালে এই GCC বন্ধ হয়ে যায় তবে দেখা যায় সেখানকার বিজ্ঞানীরাই পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিবেশগত প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। Hoffman (2011) আরো দেখান যে বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা যে কার্বন-ডাই অক্সাইডের তুলনায় মিথেন গ্যাসকে বেশি দায়ী করছে এর সাথেও নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠনের স্বার্থ সম্পর্কিত। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বণিক সমিতি এখানে নানাবিধ ভূমিকা রাখে। তারা প্রকাশ্যে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের বিপক্ষে বললেও নানা ধরণের লবিং এর মাধ্যমে মিথেন গ্যাসকে সামনে নিয়ে আসে। মিথেন গ্যাসের কথা বললে ঐ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যা নেই। এজন্য কেবল তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাপনকেই দায়ী করা যায়। প্রথম বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাস নিসৃত হয় তাকে আড়াল করাই থাকে এই বণিক সিমিতির লবিং এর মূল লক্ষ্য।

এই প্রবন্ধে এটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে না যে, ভৌত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাসমূহ ভুল। বরং বলা হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা অনেক বেশি অনিশ্চয়তা ও অনুমান নির্ভর। যা কিনা স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন হতে পারে। এভাবে যদি আমরা ভাবি তবে জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান একদিকে যেমন স্থান ও কালভেদে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা, প্রভাব ও মানুষের বোঝাবুঝি নিয়ে আলোচনা করতে পারে অন্যদিকে আবার আধিপত্যশীল কোন ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত রাজনীতিও উন্মুক্ত করতে পারে। যা কিনা জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ে আমাদেরকে পুনর্ভাবনারও সুযোগ করে দিতে পারে।

৫. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন এজেন্ডায় এটি একটি কেতাদুরস্ত প্রত্যয় হিসেবে রূপ নিয়েছে। উন্নয়নের দর্শন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও যে নকশা সবাই অনুসরণ করছে তাই যে পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি

করছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উন্নয়ন এজেন্সি সমূহ উন্নয়ন ডিসকোর্সের মধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনকে বোঝার চেষ্টা করছে। আর তাই জলবায়ু পরিবর্তন তার মূল বিশ্লেষণের বাইরে এসে উন্নয়ন এজেন্ডার একটি বৈশ্বিক প্রপঞ্চে পরিণত হয়েছে। এই বৈশ্বিক প্রপঞ্চ স্থানিক ভিন্নতাকে স্বীকার করলেও বৈশ্বিক ক্ষমতার কারণে তাকে গুরুত্বহীন করে তোলে। স্থানিক ভিন্নতাকে গুরুত্বহীন করে তোলার পেছনে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে বিজ্ঞান বা ভৌত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও সূত্রাবলী একটি বৈশ্বিক সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিজ্ঞান এমন একটি মহান বয়ান হিসেবে আমাদের সামনে আসে যা বিদ্যমান সকল কিছুকে বৈধ না অবৈধ, গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তার সনদ দেবার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ধারণ করে (খন্দকার ২০১০)। বিজ্ঞানের এই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আমাদের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ব্যাখ্যা সমূহকে নৈতিক, আবশ্যিক ও প্রশ্নহীন করে তোলে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের এই একক কর্তৃত্ব জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাসমূহকে গুরুত্বহীন ও দ্বিতীয় সারির জ্ঞানে পরিণত করে। ধরে নেয়া হয় ভৌত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যেহেতু সত্য তাই এটা নিয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের খুব বেশি পরিসর নেই। কিন্তু আমরা উপরোক্ত আলোচনায় দেখেছি সামাজিক বিজ্ঞান এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক বাস্তবতা, ভিন্নতা ও এর রাজনীতি উন্মুক্ত করতে পারে একই সাথে বিজ্ঞানের একক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরতে পারে। আবার সামাজিক বিজ্ঞান আমাদের এও দেখায় যে সামাজিক বিজ্ঞানকে দ্বিতীয় সারির জ্ঞানে পরিণত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক উন্নয়ন ডিসকোর্সে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ব্যাখ্যাকে প্রশ্নহীন হিসেবে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। তাই সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক বিজ্ঞান আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ করে দেয়। যে ভাবনা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের আধিপত্যশীল ধারণাকে পুনর্ভাবনার সুযোগ করে দেয়।

টীকা

১। ডিসকোর্স প্রত্যয়টির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে জ্ঞান, ক্ষমতা ও রাজনীতি। Michel Foucault তাঁর *The Archæology of Knowledge* (1969) এ বলেন ডিসকোর্স চিন্তা করার কিছু উপায়কে নির্দিষ্ট করে দেয়। ঐ উপায়টি একটি মতাদর্শিক অবস্থান তুলে ধরার মাধ্যমে নিজেকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। একই ভাবে চিন্তা করার অন্য উপায়গুলোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

২। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সত্যতা নিয়ে বিদ্যাজগতের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে Hoffman-এর (2011)।

৩। Latour (1999), Taylor and Buttel (2006) ও Haraway (1991) তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে বিজ্ঞান ও রাজনীতিকে আন্তঃসম্পর্কিত হিসেবে ভেবেছেন। Latour (1999) প্রশ্ন করেন বাস্তবতাকে আমরা কীভাবে বিশ্বাস করি? তার মতে বাস্তবতাকে আমরা নিজের চোখে নয় বরং বিজ্ঞানীর চোখে দেখে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। বিজ্ঞানী যে তথ্য সংগ্রহ করে ও তার নিশ্চিত বয়ান তৈরি করে তার উপর বিশ্বাস রেখেই আমরা বাস্তবতাকে অনুভব করি। আর এখানেই রয়েছে রাজনীতি। বিজ্ঞানের নিশ্চিত বয়ানের কারণে আমরা ঐ বাস্তবতাকে প্রশ্নহীন ও নৈতিক করে তুলি। বিস্তারিত দেখুন Latour, Brouno (1999) Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. অন্যদিকে Taylor and Buttel (2006) এর মতে, বিজ্ঞান সমাজ বিচ্যুত কোন বিষয় নয়। বিজ্ঞানের সত্য বা মিথ্যা নির্ভর করে ঐ সমাজের গ্রহনযোগ্যতার উপর। সামাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আকার দেয়। বিস্তারিত দেখুন Taylor and Buttel (2006) How do we know we have global environmental problem? Science and the globalization of environtal discourse.আবার Haraway (1989)এর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা পশ্চিমা শেতাঙ্গ ও পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা দ্বরা পক্ষপাতদুষ্ট। তাই এর বস্তুনিষ্ঠতার দাবি অবান্তর। তার মতে এখানে সত্য আবিস্কার করা গল্প বলার মতোই। বিস্তারিত দেখুন Haraway (1989) Primate Vision: Gender, race and the nature in the world of modern science.

৪। The United Nations Framework Convention on Climate Change".এ জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংজ্ঞাটি দেয়া হয়েছে। দেখুন http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1349.php.

৫। IPCC সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, "Climate Change 2007: The PhysicalScience Basis: Summary for Policymakers," available online at the IPCC website, http://www.ipcc.ch/.

৬। BCCSAP সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন MoEF – Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh (2008).Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008. Dhaka: Ministry of Environment and Forests.

৭। NAPA সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন MoEF – Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh (2005).National Adaptation Programme of Action (NAPA). Dhaka: Ministry of Environment and Forests.

৮। একটি এন.জি.ও তে Women and Climate Change Adaptation in the Ganga River Basin নামক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার ঐ বন্ধুটি উক্ত বক্তব্যটি বলে।

৯। Limit to Growth সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন Meadows, D. H. et al (1972) The Limits to growths.University Books, Newyork.

১০। কল্পিত সম্প্রদায়' ধারণাটি বেনেডিক্ট এন্ডারসনের। এন্ডারসন জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় জাতিকে অবহিত করেছেন কল্পিত রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে। কল্পিত একারনে যে, এখানে একজন আরেকজনকে না দেখেও একই ভাবনা, অনুপ্রেরণা ও চেতনার মধ্য দিয়ে যায়। এই ভাবনা তৈরিতে মূখ্য ভূমিকা পালন কওে মুদ্রন পুঁজিবাদ। বিস্তারিত দেখুন Anderson, B. (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

১১। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *প্রথম আলো*, ১৩ই জুন ২০১১ সংখ্যা "মেরুর বরফ গলছে না"।

১২। Andrew J. Hoffman পরিবেশগত বিষয়ের উপর সমাজ-রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পান যুক্তরাষ্ট্রে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পলিসি সমূহে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রভাব রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন Hoffman (2011)।

তথ্যপঞ্জী

Anderson, B. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Boehmer-Christiansen, S. 1994a. Global Climate Protection Policy: The Limits of Scientific Advice: Part 1. *Global Environmental Change*, 4(2).

Boehmer-Christiansen, S. 1994b. Global Climate Protection Policy: The Limits of Scientific Advice: Part 2. *Global Environmental Change*, 4(3).

Boston, J. 2008. Global Climate Change Policies:From Bali to Copenhagen and Beyond. *Policy quarterly*, Vol.4, Num.1.

Crist, E. 2007. Beyond the Climate Crisis: A Critique of Climate Change Discourse. In *Telos*, 141. www.telospress.com.

Foucault, M. 1977. *Discipline and Punishment.* London: Allen Lane.

Giddens, A. 2008. The politics of climate change: National responses to the challenges of global warming, *Policy network.*

Grundmann, R. 2007. Climate Change and KnowledgePolitics. *Environmental Politics*, Vol. 16, No. 3.

Hajer, M. 1995. *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process.* Oxford: Clarendon Press.

Haraway, D. 1989. *Primate Vision: Gender, Race and the Nature in the World of Modern Science.* London: Routledge.

Hoffman, A. 2011. The Culture and Discourse of Climate Skepticism. *Strategic Organization*, 9(1).

Houghton, J. T., Jenkins, G. J. & Ephraums, J. J., eds. 1990. *Climate Change: The IPCCScientific Assessment. Report of Working Group 1.* Cambridge: Cambridge University Press.

Houghton, J. T., Meira Filho, L. G., Callender, B. A., Harris, N., Kattenberg, A. & Maskell, K. eds. (1996) *Climate Change 1995: The Science of Climate Change.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hussain, M. Akbar. 2001. Human-Environment Relationship: Anthropological Theoretical Perspectives. *Jahangirnagar Review (Social Science)*, 25.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, *Climate Change 2007: The PhysicalScience Basis: Summary for Policymakers*, available online at the IPCC website, http://www.ipcc.ch/.

Latour, B. 1993. *We Have Never Been Modern.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Latour, B. 1999. *Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies.* Massachusetts: Harvard University Press.

Meadows, D. H. et al. 1972. *The Limits to growths.* New York: University Books.

Miller, C. A. & Edwards, P. N. 2001. *Changing the Atmosphere. Expert Knowledge andEnvironmental Governance.* Cambridge, MA: MIT Press.

MoEF – Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. 2005.*National Adaptation Programme of Action (NAPA).* Dhaka: Ministry of Environment and Forests.

MoEF – Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. 2008. *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008.* Dhaka: Ministry of Environment and Forests.

Moscovici, S. 1984. The Phenomenon of Social Representations. In R M Farr and S. Moscovici. eds. *Social Representations.* Cambridge: Cambridge University Press.

Shiva, V. 1988. Reductionist Science as Epistemological Violence. In A. Nandy. ed. *Science, hegemonyand Violence: A Requiem for Modernity.* Oxford: Oxford University Press.

Taylor, P. and Buttel, F. 2006. How Do We Know We Have Global Environmental Problem? Science and the Globalization of Environmental discourse. In Nora Henn and Richard Wilk. eds.*The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and Sustainable Living*, New York: New York University Press.

খন্দকার, নাসরিন (২০১০) বিজ্ঞানের সামাজিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে জৈবিক বিজ্ঞানের পুনর্পাঠ, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, সংখ্যা ১৫।

মজাহার, ফরহাদ (২০১১) *প্রাণ ও প্রকৃতি*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।